পাক-ভারতে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

ইংরেজদের ভারত বিজয়ের পরক্ষণে মুসলমানদের মধ্যে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যে জাতি কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাঁদের পক্ষে এ এক কঠোর আঘাতের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হল মধ্যে অসহযোগিতা বা অন্য যেকোনো প্রকারে বিদেশী শাসন উৎপাটন করার এক প্রবল ইচ্ছার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করা। অল্প সংখ্যক লোক, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ বিদেশীদের সাথে সমঝোতায় আসবার পক্ষে ছিলেন যে, এরূপ বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত মুসলমান রেনেসাঁর পক্ষে ফলপ্রসু হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের জীবনে এ প্রতিক্রিয়া এক ক্ষীণ স্রোতের মতো কাজ করছিল। নবাব আবদুল লতীফ এই সমঝোতা সৃষ্টির অগ্রে ছিলেন এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ অনেক চেষ্টার পর কলিকাতায় মুসলিম সুধী সমাজ স্থাপন করতে সক্ষম হন। কিন্তু এ-সময় এবং তার পরক্ষণে মুসলমান এক জাতি হিসেবে ইসলামের প্রধান নীতিগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ফ্রাঙ্কদের (যেহেতু তাদের এরূপ বলা হত) বিরুদ্ধে এক মিলিত প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। বাস্তবিকই ইহা একটি ইসলামিক আন্দোলন ছিল এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভী এবং ইসমাইল শহীদ এর অগ্রে ছিলেন।

যদিও ওহাবী আন্দোলনের সাথে এর কিছুটা মিল ছিল, তথাপিও প্রকৃত পক্ষে তা বলা যায় না এবং হান্টার সাহেব নিজেই খামখেয়ালীর বশবর্তী হয়ে এর মধ্যে নজদের আবদুল ওহাব কর্তৃক গঠিত আন্দোলনের পরমাণু দেখতে পান। এসব আন্দোলনের মধ্যে যে সাদৃশ্য ছিল, হান্টার সাহেব শুধুমাত্র তাই দেখেন। গরমিলের অঙ্গটা তিনি লক্ষ্য করেন নি। যদিও এ আন্দোলন সফলতা অর্জন করিতে পারেনি, তথাপিও মুসলমানদের জীবনে এর প্রতিফলন বয়ে যায়। এ রদবদলের সময়ের মধ্যে এদেশের উৎখাত জমিদারগণ জনসাধারণের মধ্যে বৃটিশ প্রতিকূল ভাব সৃষ্টি করেন এবং দেশীয় সিপাহীদের যারা আগে থেকেই তাদের উচ্চশ্রেণীর বৃটিশ কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্বে অসন্তুষ্ট ছিল, তাদের নিজেদের পক্ষে আনতে সক্ষম হন। এর ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যদিও হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে এ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন, তথাপিও শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র মুসলমানদেরকেই এ জন্য দায়ী করা হয়। অতএব, এ উপমহাদেশ থেকে মুসলমানদের স্থায়িত্ব একেবারে মুছে ফেলাই বিদেশী বিজেতাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠে। এ কাজের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বাজেয়াপ্ত আইন পাশ করা হয়। যার ফলে পাঠান ও তুর্কীদের শাসনকালে মুসলমানদের দেয়া আয়মা ও জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়। পরক্ষণেই এ জমিতে তৎকালীন বিজেতাদের চাকুরীতে নিয়োজিত অনুগ্রহ ভাজন হিন্দুদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে মুসলমানদের জীবন খুবই সংকটাপন্ন হয়ে উঠে এবং তারা জীবন রক্ষাকল্পে অন্য কোথাও বিশেষ করে মিসরে হিজরৎ করার বিষয় বিবেচনা করছিলেন। এ সঙ্কটময় মুহূর্তে স্যার সৈয়দ আহমদ আশার আলো নিয়ে কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এ মহাদেশে মুসমানদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তবে তিনি যে সফলতা লাভ করেন নি- এ নিঃসন্দেহই বলা যেতে পারে।

তিনি যে আন্দোলন শুরু করেন ইতিহাসে তা আলিগড় আন্দোলন নামে অভিহিত এবং এর উদ্দেশ্য ছিল, এ দুরবস্থায় মুসলমানদেরকে সমঝোতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া। এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করলে একে প্রকৃত ইসলামিক আন্দোলন বলা যায় না! তৎকালীন উৎখাত মুসলমানদের মূলনীতিগুলো প্রতিষ্ঠা করা কোনোমতেই এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এ আন্দোলন পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও দর্শনের মাধ্যমে ইসলামের মূলনীতিগুলো পুনঃপরীক্ষা করতে চেয়েছিল। এ অবস্থা প্রমাণ করবার জন্য এখানে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সর্বপ্রথম স্যার খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের সামঞ্জশ্যগুলো দেখাতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় চেষ্টা ছিল কোরানের তাৎপর্য বের করা। তিনি কোরানের উপর গুরুত্ব আরোপ

করেন এবং রসূলের (দঃ) হাদীসকে পেছনে ফেলে রাখেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিজ্ঞানগত শিক্ষা প্রচার করা এবং তিনি বিজ্ঞানকে ইসলামের উপর স্থান দেন। এ অতিরিক্ত মনোভাবাপন্নতার ফলে তিনি কোরানের ঐ নীতিগুলো প্রত্যাখ্যান করেন, যেগুলো তৎকালীন বিজ্ঞান মতবাদের বিরুদ্ধে ছিল। এতে প্রকৃত ধর্মীয় নীতিগুলোর খুবই বরখেলাপ হয়।

কিন্তু আলিগড়ে একটা কলেজ স্থাপন করা বাস্তবিক পক্ষে তাঁর আশ্চর্য সফলতা। তাঁর এবং ইসলামিক ঐতিহ্যধারী অনেক লোক তাঁর সাথে যোগ দেন। এদের মধ্যে সৈয়দ মেহদী আলী এবং শেখ মেহদী আলতাফ হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ মেহদী আলী পরে নবাব মহসিন-উল-মূলক সরলতার সহিত সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্ররোচিত হন এবং এ উপমহাদেশের মুসলমানদের আধুনিক যুগের সহিত খাপ খাইয়ে নেয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ আশাতেই তিনি তাহজিব নামক পত্রিকায় রীতিমত লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কতকগুলো পুরাকালীন ধারণা এবং ইসলামের মূলনীতির সহিত পার্থক্য থাকা বিধায় তিনি মাঝে মাঝে সীমাতিক্রম্য মত পোষণ করতে থাকেন। তিনি যে ফ্রাঙ্কদের সহিত একটি বোঝাবুঝিতে আসতে চেয়েছিলেন তা এতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসলামিক মতবাদের পক্ষে থেকে তুর্কী সুলতানদের অস্বীকার করেন নি। তিনি তাদের অস্বীকার করেছিলেন, যেহেতু তারা বৃটিশ স্বার্থের অন্তরায় ছিলেন। স্যার সৈয়দ এবং তাঁর পথগামীদের দ্বারা এ-নীতি বিস্তারের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ধর্মীয়দের দুনিয়াভাবান্ন করা। ধর্মকে দুনিয়ার সকল কাজ-কর্ম থেকে সরিয়ে রাখা হয় এবং একে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে হয়। বর্তমানে অধ্যাপক খুদা বখস এবং আল্লামা ইউছুফ আলীকে এ গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে ধরা যেতে পারে।

খুদা বখস এমনকি এও বলেন যে, "প্রকৃত পক্ষে বুঝিতে গেলে কোরান আধ্যাত্মিক জীবনেরই পরিচালক। রাজনৈতিক জীবন-পদ্ধতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এবং আল্লামা ইউছুফ আলী তাঁর সহধর্মীদের কোরানের আদর্শের পরিবর্তে সুইস-নীতি অথবা নেপোলিয়নের নীতি অনুসরণ করতে উপদেশ দেন। এদের মধ্যে হায়দরাবাদে স্যার আহমদ হোসেন (সাধারণতঃ নবাব আজিজ নামে অভিহিত) দুনিয়াবী ব্যাপারে সকল হেরোভদেরও (ইহুদী) উপরে যায়। তিনি মন্তব্য করেন, প্রকৃত ইসলাম খ্রীস্টধর্মের কাট-ছাট সংস্করণ। কিন্তু একটা অন্ধকার মেঘখণ্ডের মতো এ আন্দোলনের মধ্যে এক রূপালি শিখার আলো লুকায়েছিল। এরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে আলিগড়ের ধর্মভাবাপন্ন শেখ আলতাফ হোসেন হালি এগিয়ে যান। যাকে ভুললে এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ মারাত্মক অন্যায় করবেন।

হালির মুছাদ্দাস একটি পরিস্কার দৃষ্টি সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। তিনি মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ দেখিয়ে দেন এবং বাঁচবার জন্যে তাদের কোরানের নীতি আঁকড়িয়ে ধরতে উপদেশ দেন। তথাকথিত পাশ্চাত্য সুধীসমাজের বিরুদ্ধে তাঁর নীতি শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক ছিল না। ইহা ছিল ইসলামের বাণীর দিকে একটি সরাসরি আহবান ও সরল বিশ্বাস। তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ সরল সত্যের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ইসলাম পাশ্চাত্য মতবাদের ধর্ম নহে। এ জগতেও জীবনকে সুখী করার জন্য সকল দিক থেকে এর নীতি অবলম্বন করা উচিত। অতএব, তিনি সোজাসুজি স্যার সৈয়দ ও তাঁর মতবাদীদের সমঝোতার নীতি পরিহার করেন এবং ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। হালির সমসাময়িকদের মধ্যে দুজন যথা-আকাউল্লা এবং নাজির আহমদ তাঁকে অনুসরণ করেন। এদের মধ্যে আকাউল্লা তৎকালীন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারসমূহ উর্দূতে প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কিন্তু শেষোক্ত জনের (নাজির আহমদ) দান অনেক বেশী। বলতে গেলে তিনি স্যার সৈয়দের শিক্ষার একটি বিতর্কমূলক নীতি প্রচার করেন। তিনি শাহ ওয়ালী উল্লার ন্যায় ইসলামের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি এদেশের যুবকদের অবিশ্বাসী মতবাদ পরিহার করে এ জগতে একটি সৎ জীবনযাপন করবার জন্যে ইসলামের আদর্শ আঁকড়িয়ে ধরতে আহবান করেন। হালি ও নাজির আহমদ এবং শিবলী নোমানীর চিন্তাধারা ও শিক্ষার মধ্যে আরও অগ্রগতি পাওয়া যায়। তিনি স্যার সৈয়দের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন এবং মুসলিম জীবনে ইসলামকে অভিষিক্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব থেকেই আব্বাসীদের শাসনের প্রতি আসক্ত থাকায় তিনি আব্বাসী শাসনের উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। এ শাসনের প্রতি আপত্তি থাকা ছাড়াও ধর্মীয় ব্যাপারে ন্যায়-নীতিকে সর্বোচ্চ স্থানে ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাঁর দান কোনোমতেই কম নহে। অনুন্নত যুগের উলেমাদের যেভাবে তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে ন্যায়নীতিকে সর্বপ্রধান উপকরণ বলে মনে করেন, তাই বলে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উপকরণের মৃত্যু ও গুরুত্ব অস্বীকার করেন নি।

তাঁর বর্ণানায় ন্যায়নীতি ধর্মের একটি পদ্ধতি, যা এর সৎকাজে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু অসৎকাজে নয়। ন্যায়নীতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ইলমূ-ল-কালাম নামে একখানা কেতাব লিখেন এবং এর মাধ্যমে ন্যায়নীতি ব্যবহারের একটি জড়িত ইতিহাসের অবতারণা করেন। তিনি নিজে দর্শনশাস্ত্রে খুব পারদর্শী ছিলেন এবং এ ইতিহাসের প্রথম সংখ্যায় দেখান যে, পুরাকালের সকল ভাল উলেমাই দর্শন শাস্ত্রে উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু আলিগড়ের প্রচলিত নীতিবাদ তাঁর মতের পক্ষে অনুকূল

ছিল না। অতএব, এখানেই তিনি ক্ষান্ত হন এবং ১৯০৮ সালে লক্ষ্ণৌতে নবপ্রতিষ্ঠিত নাদওয়াতুল উলেমার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এমনকি সেখানেও তিনি গোঁড়া সম্প্রদায়ের জন্যে সুখে ছিলেন না। এবং শেষ পর্যন্ত □দারুল মুসান্নিফীন□ নামক লেখকদের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার জন্যে আজিমগড়ে স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

সৈয়দ আমীর আলী প্রকৃতপক্ষে শিবলী নোমানীর জ্ঞানী শিষ্য ছিলেন। শিবলীর আগে থেকে তৈরী করা পথ অনুসরণ করে আমীর আলী স্যার সৈয়দ আহমদের বিপরীতার্থক নীতি প্রত্যাহার করেন এবং প্রচার করেন যে, মুসলমানদের ইতিহাস গৌরবময় এবং এমনকি বর্তমানেও অতীতকাল মুসলমানদের প্রেরণা দিতে পারে। মুসলমানদের ইতিহাস এবং □ইসলামের তেজ□ এ উদ্দেশ্য ছিল অতীতকালে সম্পন্ন পূর্ণপুরুষদের কাজ দ্বারা মুসলমানদের প্রেরণা দেয়। স্যার সৈয়দ আহমদের নীতির সহিত গরমিলের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে বলতে হয় যে, এক পক্ষে সৈয়দের মতে স্ত্রী-জাতির অধঃপতনের জন্য ইসলাম দায়ী নহে; অন্য পক্ষে সৈয়দ আমীর আলীর মতে ইসলামই সর্বপ্রথম ধর্ম যা স্ত্রী-জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয় এবং ইসলামই তাদের জন্য একটি স্থান অনুমোদন করে; ইসলাম যে স্ত্রী-জাতিকে শুধুমাত্র দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয় তা নহে, ইহা পরোক্ষভাবে দাসত্ব প্রথা বন্ধ করে। যদিও ইসলামের উন্নতি লাভ করবার যথেষ্ট পথ রয়েছে, তথাপিও ইজতিহাদের অ-ব্যবহার একে ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়। এ দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হন। যা হোক, দুর্ভাগ্য-বসতঃ তিনিও তার পূর্ববর্তী শিবলী নোমানীর মতো আব্বাসীদের শাসনকে ইসলামী-শাসনের সর্বোচ্চ এবং আগত বংশধরদের অনুকরণীয় বলে মনে করেন। তথাপিও আমীর আলীর ইসলাম সম্বন্ধে এ জগতে সম্পন্ন করার উপযুক্ত সম্মতিসূচক মূল্যের মিলগত অভিমত একটি গৌরবময় মহৎ অবদান।

ইকবালের মধ্যে আমরা এ পর্যন্ত অজ্ঞাত চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং মনোভাবের মানবাচক পরিবর্তন দেখতে পাই। ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কাজ ছিল জগতের মুসলমানদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে জমায়েত কতগুলো আদর্শকে পরিষ্কার করে করে দেয়া। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি □নিয়ন্ত্রিত ভাগ্য-মতবাদের□- ভিত্তিকে আক্রমণ করেন। তাঁর মতে মুসলমানদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নীতিই প্রধানতঃ তাদের মধ্যে এই অপছন্দনীয় মতবাদের মূল কারণ। অতএব, তাঁর কর্তব্য ছিল পরিবর্তনশীল জীবনের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং কাজের জন্যে তাদের আহবান করা- যাতে তারা বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে ও উন্নতি করতে পারে। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে আব্বাসী সাম্রাজ্যের রূপকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে কেবলমাত্র রসূল (দঃ) কর্তৃক স্থাপিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন অথবা ন্যায়তঃ পরিচালিত খলিফাদের রাজ্যেই ইসলামী রাষ্ট্রের সত্যিকার আদর্শ পাওয়া যেতে পারে। তাঁর আদর্শগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ধর্ম ও রাষ্ট্রের মিলান্তক অভিমত, যার প্রতি অবজ্ঞা করার জন্যেই আধুনিক জীবনে এতসব উদ্ভব হয়েছে। তিনি নিজকে সন্দেহহীন বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

ইসলামে আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার দু□টি পৃথক ক্ষেত্র নহে এবং একটি কাজ মূলতঃ যতটুকু রাষ্ট্রীয়ই হউক না কেন, ইহা মনোগত ধারণা দ্বারাই নির্ণয় হয়- যার সহিত মিল রেখে উৎস কাজটি করে। মনোগত অভিরুচিই শেষ পর্যন্ত একটি কাজের রূপ দেয়। একটি কাজ ইহকালীন বা অপবিত্র, জীবন বৈচিত্রতার থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে সম্পন্ন করা হয়। ইহা আধ্যাত্মিক, যদি ইহা ঐ বিচিত্রতার দ্বারা উৎসাহিত হয়। ইসলাম- ইহা একই বাস্তবতা যা□ একদিক থেকে দেখলে মনে হয়- ধর্ম এবং অন্যদিক থেকে মনে হয়- রাষ্ট্র। ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে একই জিনিসের দু□দিক বা দু□টি সত্য মনে করা ঠিক নয়। ইসলামই একমাত্র অভিশ্লেষণীয় বাস্তবতঃ যা□ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে হয় এটা, নতুবা ওটা বলে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনকে আদর্শ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে কোনো বিভেদের স্থান দেয় না।

ইসলামী মতে ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ হল সমস্ত বিচিত্রতার মিলগত অগ্রগতি এবং তাদের মধ্যে একটি সাদৃশ্য- যাতে কোনো বিভেদের সৃষ্টি না হয়। এ উদ্দেশ্য সফল করার পথ হল আল্লার বিচিত্র গুণাবলীর অধিকারী হওয়া। রসূল (দঃ) আগেই তাঁর শিষ্যদের গুণাবলির অধিকারী হতে উপদেশ দেন। ইসলামী সমাজের আদর্শ হল:- মানব জাতির মধ্যে একতার সৃষ্টি করা যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণতার জন্য অনুভব করে। ইসলামে ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ হল সমাজতন্ত্রবাদের কাঠামোর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করা। আল্লাকে কেবলমাত্র জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করা ছাড়াও যদি তাঁকে জগতের সার্বভৌমিক শক্তি বলে মনে করা যায়, তবে এসব আয়ত্ত করা যায়। কাজেই ইসলামী-দর্শন মতে- যা অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যসব দর্শনের সমষ্টি সমস্ত অধিকারই আল্লাহর। এর কারণ অতি পরিস্কার, কারণ ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতির জন্য আল্লাহর গুণাবলির একান্তই প্রয়োজন। সমাজ-জীবনেও একতা ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টির জন্যে আল্লাহর আদর্শ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কেমলমাত্র স্বাধিকার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলেই সমাজের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ কাজ চলতে পারে, যেখানে ব্যক্তি বিশেষ অথবা সামাজিক স্বার্থের মধ্যে বিভেদের আশংকা খুবই কম থাকবে। অতএব ইকবাল ইসলামের এই প্রথম আদর্শকে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের অগগতির জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করলে কেবলমাত্র যে মুসলমানদের উন্নতি হবে তা নয়, এতে সকল দিক থেকে মানবজাতিরও অগগতি হবে।

কিন্তু আমরা যে তত্ত্বের অবতারণা করছি, তার ন্যায়গত ফল হিসেবে এ সময়ে এ উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার অনুশীলন করা প্রয়োজন, যেহেতু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মতামত একে অন্যের উপর ক্রিয়া করে। একটি ভালভাবে বুঝতে হলে অন্যটি ভালোভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

পাক-ভারতে ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলন (১৮৫৭-১৯০৬)

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো এখানেও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ধর্মের চারিদিকে ধূমায়িত হয়। অতএব ন্যায়গতভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মুসলিম জীবনে ধর্ম ও রাষ্ট্রের একত্ববোধের একটি প্রাথমিক জাগরণ দেখা দেয়। আমরা পূর্বেই সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও ইসমাইল শহীদ কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করেছি এবং বিদ্রোহের কথাও বলেছি। উভয়রকমের আন্দোলনই কতকগুলো নির্দিষ্ট কারণবশতঃ অকৃতকার্য হয়। প্রথমটি ইসলামী রাজনৈতিক জীবনে কোনো নূতন প্রচলিত জিনিস ব্যবহারের বিপক্ষে ছিল এবং এমনকি নতুন আবিষ্কৃত হাতিয়ার ব্যবহারেও অনিচ্ছুক ছিল। যাজকদের মধ্যে এরূপ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। এবং বর্তমান যুগের কৌশলীদের একেবারেই অপরিচিত ছিল। তাছাড়া স্বদেশবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতকার্যতাই মুসলমানদের বিপত্তির কারণ। তদানিন্তন বিজেতাগণ মুসলমানদের উপরই প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সংকল্প করল। স্যার সৈয়দের সময়মত বাধা তৎকালীন মুসলমানদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করল। যদিও প্রকৃতপক্ষে ইহা ইসলামিক আন্দোলন ছিল না, তথাপিও একে ন্যায়তঃ মুসলিম আন্দোলন বলা যেতে পারে।

আয়মা এবং জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনেক মুসলমানকে ভিক্ষুকে পরিরণ করা হয়। কিন্তু মুসলিম সভ্যতা মুছে ফেলেই সবচেয়ে কঠোর আঘাত হানা হয়। স্যার সৈয়দ ভবিষ্যদ্বক্তার মতোই বললেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের আগেই ধ্বংস করা হয়েছে। ১৮৬৭ খ্রীঃ কাশীতে উর্দুকে অফিস-আদালতে ভাষা হিসেবে উঠিয়ে দেবার বিরুদ্ধে এক প্রবল গণ্ডগোল হয়। যদিও স্যার সৈয়দের সময়মত কার্যদক্ষতার দরুন যুক্ত প্রদেশের ইহা প্রশমিত হয়। তথাপিও বিহারে ইহা প্রবল আকার ধারণ করে, যার ফলে উর্দু ভাষা ও দলীলপত্রের লোপ সাধিত হয়। অতি অল্প সময়ের ভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হল। একটি পৃথক জাতি হিসেবে তাদের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্যে স্যার সৈয়দ একজন দূরদৃষ্ট রাজনীতিবিদ হিসেবে মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিলেন। তাঁর ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মিরাট এবং ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে বক্তৃতাগুলো এমনকি অনুগ্রহে কংগ্রেসের মনোবৃত্তি সমন্ধে যথেষ্ট লক্ষ্য দান করে, যদিও নিয়মতান্ত্রিক সংস্করণের দাবীতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপিও তাঁর মতে মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না।

কংগ্রেসের যুক্ত-নির্বাচনের জন্য কোলাহলে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবে পরিণত হল। ১৮০৯ খ্রীঃ যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতে এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যাতে পূর্বের শরীফ গোষ্ঠীর কেউ মনোনীত হতে পারেন না। ইহাই শেষ নহে। ১৮৯৩ খ্রীঃ স্বর্গীয় বলগঙ্গানিধি তিলকের নেতৃত্বে গো-জাতি রক্ষার্থে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের গো-যবেহ বন্ধ করা। ১৮৯৮ খ্রীঃ স্যার সৈয়দ মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু পর ১৯০০ খ্রীঃ তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশীর শাসনকর্তা তাঁর আদালত থেকে উর্দু ভাষা উঠিয়ে দিয়ে তৎস্থলে দেবনাগরীর প্রবর্তন করেন। এসময় জাতীয় কর্ণধার হলেন প্রাতঃস্মরণীয় নবাব মহসিন-উল-মূলক ও ভিকারুল মূলক। যদিও উভয়েই হায়দরাবাদের নিজামের অধীনে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তথাপিও এ ঘৃণ্য অভিসন্ধির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য চাকুরি ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁরা সভা-সমিতি করলেন এবং যুক্ত প্রদেশের শাসনকর্তার এরূপ স্বেচ্ছাচারীতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন কিন্তু এতে কোনো ফল হল না।

মুসলমানগণ তাঁদের অধিকার রক্ষার্থে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের জরুরী প্রয়োজন অনুভব করলেন। নবাব ভিকারুল-মূলকের অসীম চেষ্টার ফলে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে আলিগড় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান নামে এক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণের প্রাতঃকাল ১৯০৫ খ্রীঃ তদানীন্তন রাজ প্রতিনিধি লর্ড কার্জন কর্তৃক পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে দুটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টির দ্বারা অনুবর্তিত হয়। পাঁচ বৎসর যাবৎ ইহা বিবাদের কারণ হয়ে থাকে। উহা স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতার দ্বারা খুব একটি জোরালো মঞ্চ থেকে আক্রান্ত হয়। ইতিহাসে ইহা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে অভিহিত। বঙ্গভঙ্গের পূর্বে তদানীন্তন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিন্টো মিশেষভাবে অনুভব করছিলেন যে, মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষিত না রাখলে কোনো মুসলমানের পক্ষে প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় আইন সভায় মনোনীত হওয়া অসম্ভব হবে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে এত সতেজভাবে জাগরিত ছিল যে, তিনি একে অবহেলা করতে পারলেন না। অতএব, তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা পরিবর্ধনের জন্যে একটি উপদেষ্টা সংঘ স্থাপন করলেন।

অতএব, মুসলমানদের তাঁর সম্মুখে তাদের দাবী দাওয়া পেশ করার প্রয়োজন ছিল। ১৯০৬ সালের অক্টবর মাসে মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে তাঁর সহিত দেখা করার জন্য এক প্রতিনিধি সংঘ গঠিত হয়। এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিল পৃথক নির্বাচনের

প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন ভারতের সুধীবৃন্দ নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতিতে যোগদান করার জন্যে ঢাকায় আগমন করেন। নবাব স্যার সলিমুল্লা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে একে উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন।

সূত্রঃ হাসান জামান সম্পাদিত 'শতাব্দী পরিক্রমা' গ্রন্থ

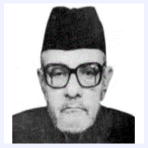

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমালোচক। তার নানা মরমি কবি হাসান রাজার বাড়িতে সুনামগঞ্জে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একজন বড় সমর্থক।
তিনি সিলেটের রারিচাঁদ কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এমএ ডিগ্রী অর্জন করেন। সুনামগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। এরপর ঢাকার আবুজর গিফারীতে অধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন এবং ইসলাম শিক্ষা বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করেন।
১৯৩৬ সালে মুহাম্মদ নূরুল হক ও অন্যান্যদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় তিনি সিলেটে 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ' গঠন করেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৪৯ সালে তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন থেকে আজীবন মজলিসের সুদিন-দুর্দিনে সভাপতি ছিলেন।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মিছিল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের বাসা থেকেই সর্বপ্রথম বের হতো এবং সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে আবার তাঁর বাসাতেই ফিরে আসতো। ভাষা আন্দোলনের জোর সমর্তনে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা নওবেলাল এ জোর প্রতিবাদ গড়ে তুলেন। এজন্য অনেক কাঠখড় পোহাতে হয় তাঁকে, তবুও তিনি সেই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসেননি।
তিনি আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সমর্থক হয়ে আসামে মুসলিম অভিবাসীদের উপর জুলুমের প্রতিবাদে মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে আসাম প্রাদেশিক কমিটিতে নির্বাচিত হন। কিছুদিনের জন্য তিনি পাকিস্তান দার্শনিক কংগ্রেসের সদস্য এবং কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ দার্শনিক এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন তিনি।
১৯৫৮ সালে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ড. হাসান জামান ও তৎকালীন ফ্রাংকলিন পাবলিকেশনের পরিচালক এটিএম আবদুল মতিন, মাওলানা মহিউদ্দীন খান প্রমুখের সাথে মিলে দারুল উলুম ইসলামিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। আবুল হাশিম এর প্রথম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। ইসলামিক একাডেমী ঢাকা নামে অভিহিত এ প্রতিষ্ঠানটিই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ' নাম নিয়ে কাজ করে চলেছে।
১৯৫৮ সালে বাংলা একাডেমীর কাউন্সিলর এবং ১৯৬৬ সালে বিজাতীয় সংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তিনি নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠায়ও সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে ৬৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে: তমদ্দুনের বিকাশ, সত্যের সৈনিক আবুজর, ইতিহাসের ধারা, নতুন সূর্য (গল্প গ্রন্থ), ব্যাকগ্রাউন্ড অব দি কালচার অব বেঙ্গল, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, ফিলোসফী অব হিস্টোরি, সাইন্স এন্ড রেভেলিউশন, ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে, ইসলাম ও মানবতাবাদ, সন্ধানী দৃষ্টিতে ইসলাম, দর্শনের নানা প্রসঙ্গ, আজাদী আন্দোলনের তিন অধ্যায়, আমাদের জাতীয়তাবাদ, ইসলামিক মুভমেন্ট, ধর্ম ও দর্শন, নয়া জিন্দেগী (উপন্যাস), বিজ্ঞান ও দর্শন (৩ খন্ডে), সিলেটে ইসলাম প্রভৃতি ছাড়াও আরো কয়েকটি গ্রন্থ। এছাড়াও তার ৪০টিরও অধিক অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে।
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে পুরস্কার লাভ করেন। স্বাধীনতা পুরস্কার, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, একুশে পদক-সহ অনেকগুলো সাহিত্য পুরষ্কারে ভূষিত হন। জাতীয় অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন ১৯৯৩ সালে।
মারা যান ১৯৯৯ সালে এবং পারিবারিক কবরস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।